International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-V, September 2021, Page No. 01-10
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i5.2021.1-10

পুব-সাগরের পার হতে : অন্তরঙ্গ পাঠ

Dr. Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, Burdwan, West Bengal

Abstract :
The aim of the present paper is to explore the linguistic features of a well-known song of Tagore composed on the theme of monsoon: pub sāgarer pār hate. Our analysis is confined to the poetic aspect of the song, the musical aspect is excluded. We have undertaken an in depth study of the text at two levels namely semantic level and phonetic level. At the semantic level, the use of metaphors and imageries distinguishes the song from the other songs composed on the same theme. A salient feature of the song at the phonetic level is the use of onomatopoeias and reduplicated structures which is conformity with the theme of the song.

Key Words: Tagore's songs of monsoon, semantic level, phonetic level, metaphors, onomatopoeias

এই নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের বর্ষা উপপর্যায়ের একটি গানের অন্তরঙ্গ ও ভিন্নতর পাঠ : পুব-সাগরের পার হতে (প্রকৃতি/ গানসংখ্যা ৬৮)। সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, এই বর্ষাসঙ্গীতটির কাব্যরূপটি আমাদের আলোচ্য। এই গানের কাব্য অবয়বের অন্তর্লীন সৌন্দর্য আস্বাদনের লক্ষ্যে আমরা তার বিভিন্ন গঠক উপাদান বিশ্লেষণ করব : শব্দচয়ন, পদসমূহের পারস্পরিক অন্বয়, বিভিন্ন ব্যাকরণগত উপাদানের ব্যবহার, রূপকের প্রয়োগ। গানটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে দুটি স্তরে --- আর্থ স্তর (semantic level) এবং ধ্বনিগত স্তর (phonetic level)। বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠের মধ্য দিয়ে বর্ষাসঙ্গীতের মধ্যে এই গানটির স্বতন্ত্র স্থানটি ধরা পড়বে।

পুব-সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী--
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি॥
সহসা তাই কোথা হতে কুলু কুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী॥
আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু ডমরুরব হয়েছে ওই শুরু।
তাই শুনে আজ গগনতলে পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরন নাগ নাগিনী ছুটেছে উদাসী॥[১]

প্রথমে গানের আর্থ বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা যাক।

গানের প্রথমার্ধ (আস্থায়ী ও অন্তরা) ও দ্বিতীয়ার্ধের (সঞ্চারী ও আভোগ) মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিপূর্ণ প্রতিসাম্য চোখে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমে আছে একটি শ্রুতিগ্রাহ্য রূপকল্প, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে একটি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি (আস্থায়ীতে সাপ খেলানো বাঁশির সুর, সঞ্চারীতে ডমরুধ্বনি) এবং তারপর একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্প (অন্তরায় দ্রুত প্রবহমান জলধারা, আভোগে ধাবমান সর্পকুল)। দুটি ক্ষেত্রেই ধ্বনি এবং দৃশ্যের মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায় : সাপ খেলানো বাঁশির আকর্ষণে যেমন জলধারা দিকে দিকে ছুটে চলেছে তেমনি করেই ডমরুধ্বনির আহ্বানে অগ্নিবরণ নাগনাগিনীরাও ছুটে চলেছে। "তাই" অব্যয়ের ব্যবহারে এই কার্যকারণ সম্বন্ধটি সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়েছে (সহসা 'তাই' কোথা হতে / 'তাই' শুনে আজ...)।

আস্থায়ী ও সঞ্চারী উভয় তুকেই রূপকের প্রয়োগ করা হয়েছে । বাদল বাতাসের হাহারবের উপমা যেমন সাপুড়ের বাঁশির সুর, তেমনি গভীর মেঘস্বনের উপমা দিগন্তপরিব্যাপ্ত ডমরুরব। আভোগেও ব্যবহৃত হয়েছে রূপক --- বিদ্যুৎশিখার উদ্গীরণের উপমা দ্রুত ধাবমান সর্পকুল। তবে অন্তরায় অন্য তুকের সমান্তরালে কোন রূপক আসে নি। এই অংশে ধাবমান জলধারার চিত্রায়ণ সম্পূর্ণভাবেই ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার ধারাভাষ্য --- সেই দিক থেকে গানের এই অংশটি ব্যতিক্রমী। রূপকের প্রয়োগ গানের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে। অন্তরা ও আভোগের দুটি দৃশ্যকল্পের মধ্য দিয়েই রূপায়িত প্রবল গতিময়তা। একই গতিদ্যোতক ক্রিয়ার পুরাঘটিত বর্তমান রূপ দুবার প্রযুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ প্রতিসম অবস্থানে : 'ছুটেছে'। ঠিক তারই পরে অর্থাৎ গানের দুই অর্ধাংশের একেবারে শেষে একটি বিশেষণ। এক্ষেত্রে অবশ্য একই বিশেষণের পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। ধ্বনিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি বিশেষণ : উল্লাসী /উদাসী।

এই দুটি বিশেষণের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা পরবর্তী আলোচনা শুরু করব। নিসর্গসৌন্দর্যপিয়াসী মানবহৃদয়ে বর্ষার রূপ ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিপরীত অনুভূতির সঞ্চার করে। কোন কোন বর্ষাসঙ্গীতে দেখা যায় বর্ষাসমাগমে শুষ্ক তাপিত মানবমন বাঁধভাঙা বিপুল প্রাণবন্যায় উদ্বেল হয়ে ওঠে; আবার আর এক শ্রেণির গানে অবসন্ন মানবমন বিশ্বসংসারের সমস্ত কিছুর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে এক অতলান্ত শূন্যতায় নিমগ্ন হয়ে যায়।

প্রথম শ্রেণির গানের মধ্যে উল্লেখ করা চলে :

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে॥[২]
(প্রকৃতি /১১৩)

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।
নিখিলচিত্তহরষা

ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।[৩]
(প্রকৃতি /২৭)

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্নান নবধারাজলে॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ--
কাজলনয়নে, যূথীমালা গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে॥ [৪]
(প্রকৃতি /৭৯)

দ্বিতীয় শ্রেণির গানের মধ্যে রয়েছে

আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার-- হায় রে॥
মনে ছিল আসবে বুঝি, আমায় সে কি পায় নি খুঁজি--
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার॥[৫]
(প্রকৃতি/৪৬)

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে
জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না ॥
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায়
মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে॥[৬]
(প্রকৃতি/১২৯)

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা--
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে॥[৭]
(প্রকৃতি/৮০)

আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণরাতি,
স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি॥
আজি কোন্ ভুলে ভুলি আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি,
মনে হয় বুঝি আসিছে সে মোর দুখরজনীর সাথি॥[৮]
(প্রকৃতি/১১৮)

আমাদের আলোচ্য গানটিতে একই পরিসরের মধ্যে অভিব্যক্ত দুই বিপরীত অনুভূতি। তবে লক্ষণীয় কোথাও কিন্তু সেই অনুভূতির বিস্তার ঘটে নি। উল্লাসী/ উদাসী--- সমগ্র গানে শুধুমাত্র দুটি বিশেষণের মধ্য দিয়ে তার চকিত আভাসটুকু মেলে। সমগ্র গানটি জুড়ে আছে শুধুই নৈসর্গিক রূপকল্প । মানবহৃদয়ের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা গানের কথাবস্তুতে ধরা পড়ে না।

শুধুমাত্র দুই বিপরীত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশই এই গানের বৈশিষ্ট্য নয়, গভীরতর বিশ্লেষণে অভিব্যক্ত অনুভূতির রূপায়ণে একটা পার্থক্য ধরা পড়ে। এই পর্যায়ে পূর্ণ প্রতিসাম্য দেখা যায় না। গানের প্রথম পর্বে, উল্লাসের পর্বে গঠক উপাদান নির্বাচনে, নির্মাণশৈলীতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে না। উদ্দাম জলস্রোতের সঙ্গে প্রবল উল্লাসের অনুষঙ্গ , অশান্ত বাদল বাতাসের হুহুঙ্কারের রূপায়ণে সাপুড়ের বাঁশির ধ্বনির রূপক প্রয়োগ বর্ষা সম্বন্ধে আমাদের চিরাচরিত ধারণাকে কোন ভাবে আঘাত করে না। এই গানে বর্ষার সাপুড়ে রূপটি অবশ্যই অভিনব, রবীন্দ্রনাথের আর কোন গানে সাপ বা সাপুড়ের উপস্থিতি দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের বর্ষাভাবনায় এমন নির্মাণকে গ্রহণ করতে কোনরকম বাধা অনুভব করি না।

এই বক্তব্য গানের দ্বিতীয় পর্ব, উদাসীনতার পর্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আমরা দেখেছি "উল্লাসী" বিশেষণের ঠিক প্রতিসম অবস্থানে "উদাসী", যে বিশেষ্যদুটিকে বিশেষিত করতে এই প্রয়োগ তাদের উভয়ের সঙ্গে দ্রুত গতির অনুষঙ্গ রয়েছে, জলধারার মত সর্পকুলও ছুটে চলেছে। কিন্তু উদাসীনতার অনুভূতির রূপায়ণে আপাতদৃষ্টিতে কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এই গানে বিদ্যুৎশিখার সঙ্গে উদাসীনতার অনুষঙ্গ। কিন্তু মানবমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অথবা সাহিত্যের উত্তরাধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে এমন অনুষঙ্গ গ্রহণযোগ্য হয় না। বর্ষায় সচরাচর উদাসীনতার সঞ্চার করে নিবিড় মেঘপুঞ্জ, অন্ধকার ছায়াবিস্তার, অবিশ্রান্ত বর্ষণ। কিন্তু বিদ্যুতের সঙ্গে বাস্তবে, সাহিত্যে চিরদিনই বিজড়িত ত্রাসের অনুষঙ্গ। মুহুর্মুহু অগ্ন্যুদ্গীরণ মানবহৃদয়কে 'উদাস' করে তোলে না। এই গানে অবশ্য বিদ্যুৎশিখার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই, কিন্তু কবি এখানে যে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন সেটিও এই অনুভূতির রূপায়ণের উপযুক্ত নয়। সাপ চিরাচরিতভাবেই হিংস্রতা, ক্রূরতার প্রতীক, এই প্রাণীটিকে আমরা অশুভ শক্তির প্রতিভূরূপে দেখতে অভ্যস্ত। প্রাথমিক পাঠে "উদাসী নাগনাগিনী"র ধারণা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই গানে সাপেদের আচরণ এবং কালগত পটভূমি কোন ভাবেই উদাস অনুভূতির উদ্রেক করার উপযোগী নয়।

"পলে পলে দলে দলে" সাপেরা "ছুটেছে"। "পলে পলে" ---- কালগত পটভূমি এই অনুভূতির সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উদাসীনতার অনুভব বিদ্যুতচমকের মত মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে সঞ্চারিত হয় না। এই অনুভূতির বিস্তার দীর্ঘ সময় জুড়ে।

"দলে দলে" --- এই দলবদ্ধতাও ঔদাস্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উল্লাস সর্বজনে পরিব্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু ঔদাস্য সবসময় বিচ্ছিন্ন করে দেয়, এই অনুভূতির সঙ্গে একাকিত্বের অনুষঙ্গ বিজড়িত।

সবশেষে বলা যায় উদাসীনতার সঙ্গে দ্রুতগতিরও সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। উল্লাসভরে ছুটে চলাতে অস্বাভাবিকত্ব নেই, কিন্তু ওদাসীন্যভরে ছুটে চলা আমাদের বিস্মিত করে।

এবার এই আপাত অসঙ্গতির ব্যাখ্যা করা যাক।

যে অচেনা পরদেশি সাপুড়ের অবির্ভাব দিয়ে গানের সূচনা, তার মায়াবী বাঁশির সুর কোন সাপকে আকর্ষণ করে না। ঝড়ের তাণ্ডবের মুহূর্তে স্ফীত উত্তাল জলরাশিকে সাপুড়ের বাঁশির সুরে নৃত্যরত সাপ বলে বিভ্রম হতে পারে কিন্তু সাপের আবির্ভাব ঘটে আরও পরে, গানের শেষে । এখানেই এই গানের সাপের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। সাপুড়ের বাঁশির সুর, সাপখেলা লোকজীবনের অঙ্গ, কিন্তু ডমরু সহযোগে সাপ খেলার সঙ্গে আমরা একেবারেই পরিচিত নই। যে সাপ সাপুড়ের বাঁশিতে সাড়া দেয় না, যাকে আকর্ষণ করতে পারে শুধুই ডমরুধ্বনি সেই সাপ আমাদের পরিচিত প্রাণীটি নয়, সেই সাপ একান্তভাবেই কবিকল্পনার নির্মাণ। কাব্যে সাহিত্যে সাপের যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেই সব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এই সাপের আচরণ ব্যাখ্যা করা যাবে না।

উল্লাস ও উদাসীনতার এই দুই পর্বের স্বাতন্ত্র্য কেবলমাত্র বাদ্যযন্ত্রধ্বনির ভিন্নতায় নয়, যন্ত্রীর ভূমিকাও এখানে বিচার্য। আস্থায়ীতে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীরও সুস্পষ্ট উপস্থিতি ; গানের সূচনাই হয়েছে সেই বংশীবাদকের আবির্ভাব দিয়ে। অন্যদিকে গানের দ্বিতীয় পর্বে বাদ্যযন্ত্রধ্বনিই কেবল ধ্বনিত হয়, যন্ত্রী সম্পূর্ণভাবেই অন্তরালে রয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য শুরু থেকেই সেই বংশীধারীকে ঘিরে কিছুটা রহস্য ঘনীভূত হয়ে ওঠে । সাগরপারের এক অজানা দেশের অধিবাসী সে ; প্রশ্নবোধক "কোন" শব্দের ব্যবহার সেই রহস্যানুভূতিকে নিবিড়তর করে তোলে। বংশীবাদকের পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত না হলেও এই রহস্যময় আগন্তুকের ক্রিয়াকলাপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। অপরপক্ষে গানে কোথাও ডমরুবাদককে আদৌ প্রত্যক্ষ করা যায় না; ডমরু যেন আপনিই বেজে চলে।

গানের কথাবস্তুতে উল্লেখ না থাকলেও ধ্বনিত যন্ত্রটি থেকে যন্ত্রীর পরিচয় নির্মাণ করে নেওয়া যায়। কাব্য সাহিত্যের উত্তরাধিকার অনুসারে এই ডমরুবাদক হতে পারেন স্বয়ং নটরাজ – যার নৃত্যচ্ছন্দে ছন্দিত ষড়ঋতুর শোভাযাত্রা। সেই বংশীধারীর মত গানে তাঁকে ঘিরে কোন প্রশ্ন জাগে না, সমস্ত জিজ্ঞাসার তিনিই অবসান, তিনি চেতনাতীত। বংশীধারীর মত তাঁর আবির্ভাব নেই, প্রস্থানও নেই।
নটরাজের ডমরুধারীরূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করি এই গানটিতে :

নৃত্যের তালে তালে নটরাজ, ঘুচাও ঘুচাও সকল বন্ধ হে।

...

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে।।[৯]

(বিচিত্র/২)

আমাদের আলোচ্য গানে আভাসিত নটরাজের ভয়ঙ্কর রূপটি নয়, নৃত্যরত রূপটি নয়, এখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর সন্ন্যাসীরূপটি। বর্ষার রূপ মানবমনে যে গভীর উদাসীনতার উদ্রেক করে তারই প্রতীক ইন্দ্রিয়চেতনার অন্তরালে স্থিত সেই মহাযোগী। ডমরুপাণির প্রচ্ছন্ন অনুষঙ্গে এই উদাস অনুভূতি এক কল্পনাতীত মাত্রা লাভ করে। এতই নিবিড়, এতই সর্বগ্রাসী সেই অনুভূতি যে তা ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত বিদ্যুতশিখাতেও সংক্রামিত হয়ে যায়। তার এই অভাবনীয় রূপটি ফুটিয়ে তুলতেই কবি ধাবমান দলবদ্ধ সর্পের রূপকল্পটি প্রয়োগ করেছেন। এই উদ্বেলিত উদাসীনতার অনুভূতি সাপের মত হিংস্র প্রাণীকেও অভিভূত করে, (জীববিদ্যায় যাই বলা থাক, জনমানসে তো এই ধারণাই প্রচলিত !) একটি কোন সাপ নয় সমগ্র সর্পকুলকেই তা আচ্ছন্ন করে দেয়, তাদের দ্রুতগতির মধ্যেও একই অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। উদাস অনুভূতির রূপায়ণে যে অসঙ্গতি প্রাথমিক পাঠে প্রতীয়মান হয় তা প্রকৃতপক্ষে এই অনুভূতির এক সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় রূপনির্মাণের কৌশল।

এই দুই পর্বের শেষাংশের বিশ্লেষণে আর একটি পার্থক্য ধরা পড়ে। জলধারা ছুটে চলে "দিকে দিকে" কিন্তু দ্রুতগতি অগ্নিবরণ নাগনাগিনীদের গন্তব্যস্থল অনুল্লিখিত রয়ে গেছে। কোন লক্ষ্যে তাদের এই ছুটে চলা? কল্পনা করা যায় ডমরুধ্বনিতে উন্মনা সর্পকুলের যাত্রা সেই ডমরুধারীরই উদ্দেশে। প্রথম পর্বের শেষে যখন জলধারার বিস্তার "দিকে দিকে", তখন ঠিক তার পরবর্তী কলিতেই অতি পরিচিত "দিগন্ত" শব্দটি এক অনন্য মাত্রা লাভ করে। সমস্ত "দিকের" যেন অবসান ঘটে যায় , চেতনার এই স্তরে সমস্ত

দিকচিহ্ন যেন অবলুপ্ত হয়ে যায়। গানের শুরুই হয়েছে এক দিকনির্দেশক শব্দ দিয়ে : পুব --- বংশীধারীর আবির্ভাবস্থল। কিন্তু ডমরুধারীকে কোন স্থানিক পরিসরে আবদ্ধ করা যায় না। তিনি দেশকালাতীত। তাই তার উদ্দেশে যে যাত্রা সেই পথের কোন দিকনির্দেশ নেই।

সাধারণ অহিতুণ্ডিকের বাঁশিতে তারা সাড়া দেয় না, এই অহিকুলের যাত্রা শুধুই অহিভূষণের উদ্দেশে, তার অঙ্গের ভূষণ হতে। তারপরই সম্পূর্ণ হবে তাঁর তাপসমূর্তি --- যার অবয়ব থেকে বিকীর্ণ অগ্নির তেজ, যার অঙ্গভূষণ সর্পদল, যিনি চির উদাসী।

যন্ত্রী ছাড়াও এই গানে দুটি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার পর্যালোচনাযোগ্য। একশ তেরটি বর্ষাসঙ্গীতের মধ্যে আমাদের আলোচ্য গানটি বাদে আর কুড়িটিতে বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি রয়েছে।[১০] বাঁশি ও ডমরু ছাড়া অন্যান্য গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি হল : বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, দুন্দুভি,মাদল। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গান ছাড়া একই গানে দুই বা ততোধিক বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি দেখা যায় শুধুমাত্র দুটি গানে : বাঁশরি ও মন্দিরা (প্রকৃতি/২৬) ; মৃদঙ্গ, মুরজ মুরলী (প্রকৃতি/ ২৭)। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানটির স্বাতন্ত্র্য শুধু উপস্থিত বাদ্যযন্ত্রের সংখ্যার কারণে নয়, ব্যবহারের কারণে। এই গানে দুটি বাদ্যযন্ত্রই রূপক, তাদের মাধ্যমে প্রতীকায়িত বর্ষার দুটি ভিন্ন রূপকল্প : বাদল বাতাস এবং মেঘগর্জন। অন্য আর কোন বর্ষার গানেই রূপক রূপে একাধিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না। শেষে উল্লিখিত যে দুটি গানে দুটি ও তিনটি বাদ্যযন্ত্র রয়েছে তার মধ্যে কোনটিই বর্ষার কোন নৈসর্গিক রূপকল্পের উপমা নয়। দুটিতেই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বর্ষাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য, আবহসঙ্গীত রচনা করার জন্য।

এবার বিস্তারিভাবে আমরা গানটি বিশ্লেষণ করব ধ্বনিগত পর্যায়ে।

বস্তুত একেবারে প্রাথমিক পাঠেই গানের যে বৈশিষ্ট্যটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল যুগ্মশব্দের ব্যাপক প্রয়োগ। আট কলিবিশিষ্ট গানটির পাঁচটি কলিতেই দেখা যাচ্ছে শব্দদ্বিরুক্তি এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ : ঘন ঘন, হাওয়ায় হাওয়ায়, সন সন , কুলু কুলু, দিকে দিকে, গুরু গুরু, পলে পলে, দলে দলে। বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাওয়ার আগেই বলা যেতে পারে যে কাব্যশরীরের এমন নির্মিতি তার মর্মবস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ধ্বনির এমন পুনরাবৃত্তি সমগ্র গানটিতে তীব্রতার সঞ্চার করছে ---যেন অবিরাম বৃষ্টিধারা, অশান্ত বাদল বাতাস ক্ষণে ক্ষণে দেহে মনে আঘাত করে যাচ্ছে।

যুগ্মশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের আলোচ্য গানটি বাদ দিলে এমন বর্ষাসঙ্গীতের সংখ্যা ৭৩।[১১] এই গানটি যেভাবে গাওয়া হয় তাতে ব্যবহৃত যুগ্মশব্দের সংখ্যা দাঁড়ায় নয়। বিস্তারিত বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে বর্ষার বিভিন্ন গানে যুগ্মশব্দের(দ্বিরুক্ত এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের) প্রয়োগসংখ্যা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

যুগ্মশব্দের প্রয়োগসংখ্যা	গানের সংখ্যা
১	১৮
২	২৮
৩	৯
৪	৬
৫	৫

৬	১
৭	০
৮	১
৯	১

এই সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে বর্ষার গানে ব্যবহৃত যুগ্মশব্দের সর্বোচ্চ প্রয়োগ সংখ্যা হল নয়। আমাদের আলোচ্য গানটি ছাড়া আর একটি মাত্র যে বর্ষাসঙ্গীতে যুগ্মশব্দের সমসংখ্যক প্রয়োগ দেখা যায় সেটি হল :

শ্রাবণবরিষন পার হয়ে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।
গোপন কেতকীর পরিমলে, সিক্ত বকুলের বনতলে,
দূরের আঁখিজল বয়ে বয়ে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে॥
কবির হিয়াতলে ঘুরে ঘুরে আঁচল ভরে লয় সুরে সুরে।
বিজনে বিরহীর কানে কানে সজল মল্লার-গানে-গানে
কাহার নামখানি কয়ে কয়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে॥[১২]

(প্রকৃতি/৪৫)

শেষোক্ত গানটিতে আমাদের আলোচ্য গানের মত যুগ্মশব্দের প্রয়োগসংখ্যা নয় হলেও, একটিও ধ্বন্যাত্মক শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয় নি।সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় অন্যান্য বর্ষার গানে যুগ্মশব্দের প্রয়োগসংখ্যা আমাদের আলোচ্য গানের তুলনায় অনেক কম।

এই সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যুগ্মশব্দের প্রয়োগের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য এই গানটিকে বর্ষার গানের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছে।
এবার গানের বিভিন্ন অংশের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যাক।

যে শব্দদ্বিরুক্তি এই গানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তার শুরু গানের দ্বিতীয় কলিতে। এই কলির এবং পরবর্তী কলিতে দলের (syllable) বিন্যাসও তাৎপর্যপূর্ণ। এই দুটি কলির ধ্বনিগত গঠনের মধ্যে যেন নিহিত রয়েছে সেই বহুপ্রতীক্ষিত সাপখেলার নানা মুহূর্তের ধারাভাষ্য।

দ্বিতীয় কলিতে মুক্তদলের (open syllable) আধিক্য। এই কলির মধ্যে কেবলমাত্র শুরুতে একটি রুদ্ধদল (closed syllable) ‘শূন্’, আর বারটি মুক্তদল (... -নে – বা - ঘ- ন- ঘ- ন –হা ... হা ... স – ন- স –ন) । এছাড়া তিনটি অর্ধ রুদ্ধদল (semi closed syllable.) : -‘জায়’ , - ‘ওয়ায়’ , -‘ওয়ায়’ । সাপুড়ে তার বাঁশিতে সুর তোলে; তার মুখনিঃসৃত প্রশ্বাসবায়ু প্রবেশ করে বাঁশির প্রায় অবরুদ্ধ পরিসরে --- অন্যন্য বাঁশির মত এই বাঁশিতে একাধিক নিষ্ক্রমণপথ নেই, নিষ্ক্রমণপথ শুধুমাত্র একটি। শেষে ওই একটিমাত্র ছিদ্রপথে সেই অবরুদ্ধ প্রশ্বাসবায়ুর নিষ্ক্রমণ ঘটে। যেন সেই প্রক্রিয়ারই ইঙ্গিতবাহী সম্পূর্ণ মুক্তদল বা সম্পূর্ণ রুদ্ধদলের পরিবর্তে অর্ধ রুদ্ধদলের এই ব্যবহার। এই অর্ধরুদ্ধ (semi-closed) ধ্বনি আরও দীর্ঘায়িত হয়ে ওঠে ---“আয়”এর স্থানে আসে “ওয়ায়” “ওয়ায়”। প্রথম প্রয়াসের পর সাপুড়ে যেন আরও শক্তিতে, মুখগহ্বর আরও স্ফীত করে অধিকপরিমাণ প্রশ্বাসবায়ু সঞ্চার করতে চেষ্টা করে। অবশেষে ছিদ্রপথে নিঃসৃত

হয়ে সুরে রূপান্তরিত সেই বায়ু সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। তারই প্রতিফলন এই কলির বৃহত্তর অংশ জুড়ে মুক্তদলের ব্যবহারে। এই অংশে "ন" ধ্বনির ব্যবহার ব্যবহার সর্বাধিক, তারপরেই 'স" ধ্বনির ব্যবহার। এই "স" এবং "ন" ধ্বনির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে "স – ন- স- ন" ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে প্রবহমান বাতাসের সোঁসোঁ ধ্বনি বেজে ওঠে। প্রথম "ঘন ঘন" শব্দদ্বিত্বের মধ্যে 'ঘ" ধ্বনির কারণে সেই বংশীরব গুরুগম্ভীর রূপ গ্রহণ করে এবং শেষে "সন সন" যুগ্মশব্দের প্রয়োগে সেই ধ্বনি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

ঘ –ন -ঘ – ন ..... স- ন – স – ন .....ঠিক তারপরের কলির শুরুতেই "সাপ" (উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত : সাপ্) । দ্বিতীয় কলিতে শুধু মুক্তদলেরই প্রাধান্য নয় সেইসঙ্গে দেখা যায় প্রতিটি শব্দই একাধিক দলে গঠিত। ঠিক তারই পরে রুদ্ধ একদলের (closed monosyllable) উচ্চারণ একটা আকস্মিক আঘাতের অনুভূতি সৃষ্টি করে । ক্রীড়ারত সাপ হঠৎ যেন ফণা বা লেজের দ্বারা সজোরে আঘাত করে। লক্ষণীয় এই কলির বাকি অংশে শুধুই মুক্তদলের ব্যবহার (খে – লা- বা- র –বাঁ- শি) । এক মুহূর্তে ঝাপটা দেওয়ার পর সাপ আর কিছুক্ষণ কোন আঘাত না করে মৃদুমন্দ অঙ্গসঞ্চালন করে যেতে থাকে।

অন্তরার দুটি কলি জুড়ে মুক্তদলের প্রায় একাধিপত্য। প্রথম কলিতে শুধুই মুক্তদলের ব্যবহার, দ্বিতীয়টিতে পনেরোর মধ্যে একটিমাত্র রুদ্ধদল ("উল্লাসী" শব্দে "উল্")।

স-হ-সা- তা- ই – কো –থা –হ- তে কু- লু –কু-লু –কু-লু –কু-লু – ক-ল-ক-ল-স্রো-তে
দি-কে-দি-কে –জ –লে - র –ধা-রা ছু-টে - ছে- উল্- লা- সী

মুক্তদলের এই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয় ধাবমান জলধারার বিপুল বিস্তার। বিশেষভাবে লক্ষণীয় কবিতায় ধ্বন্যাত্মক যুগ্মশব্দ কুলু কুলু গানে দ্বিগুণ সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে : কুলু কুলু কুলু কুলু। সেইসঙ্গে গানের কাব্যরূপে সমাসবদ্ধ পদে ব্যবহৃত "কল" শব্দটিকেও ধ্বন্যাত্মক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে : কল কল। কুলু কুলু কুলু কুলু কল কল --- এই ধ্বনিগুচ্ছের পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে বাধনহারা জলধারার কলরোল বেজে ওঠে। পরবর্তী কলিতেও সর্বাধিক ব্যবহৃত ধ্বনি 'ল'। "লে' (জ-লে-র) এবং শেষের দিকে আবার এই 'ল' ধ্বনির পরপর ব্যঞ্জনান্ত এবং স্বরান্ত উচ্চারণ ('উল্' –লা) --- পূর্ববর্তী কলিতে ধ্বনিত জলস্রোতের সুরটি কিছুটা ক্ষীণ হয়ে এলেও অব্যাহত থাকে।

আস্থায়ীতে বংশীধ্বনির সমান্তরালে সঞ্চারীতে আসে ডমরুধ্বনি। বংশীধ্বনির কোন বিস্তারিত বর্ণনা নেই, তাকে বিশেষিত করতে কোন বিশেষণ ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু এই ডমরুরব "গভীর" ---- এই বিশেষণের সার্থকতা প্রমাণ করে এই কলির ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য। আস্থায়ীর মত সঞ্চারীতেও এসেছে শব্দদ্বিত্ব " ঘন ঘন" কিন্তু তার সঙ্গে মিল রেখে 'ন' ধ্বনিযুক্ত কোন ধ্বন্যাত্মক যুগ্মশব্দ আর ব্যবহৃত হয় নি। এবার এসেছে ধ্বন্যাত্মক শব্দ 'গুরু গুরু' --- গাইবার সময় এই ধ্বনিগুচ্ছ আরও বিস্তৃত হয় : গুরু গুরু গুরু গুরু। কণ্ঠ্য ঘোষবর্ণ 'গ' ও 'ঘ' ধনির সমাহার সেইসঙ্গে 'র' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ---গুরু গুরু গুরু গুরু , ডমরুরব, শুরু ---- এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের মন্দ্ররব।

আভোগের শেষ কলিতে "অগ্নিবরণ নাগনাগিনী" শব্দগুচ্ছটির গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে 'গ' ও 'ন" ধ্বনির পৌনঃপুনিক ব্যবহারে যেন মূর্ত হয়ে ওঠে গনগনে আগুনের আভা, এমন ধ্বনিসমন্বয় তড়িৎশিখার মুহুর্মুহু উদ্গীরণের চিত্রায়ণের অনুকূল। পূর্ববর্তী কলিতে অবশ্য আমরা আবার দেখি 'ল' ধ্বনির প্রাধান্য --- দলে দলে পলে পলে। এখানে অবশ্য অন্তরার মত ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করা হয় নি, এখানে 'ল' ধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে প্রবহমান স্রোতধারার অনুকরণ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। বলা যেতে পারে এই 'ল'

ধ্বনির প্রয়োগ সর্পদলের গতিময় সঞ্চরণের মধ্যে যেন কিছুটা কোমলতার আভাস ফুটিয়ে তোলে। সর্পদল ছুটে চললেও তারা তো জলধারার মত উন্মত্ত গতিতে ছুটে চলে না ; উদাসীন তাদের চলার মধ্যে সেই স্বাতন্ত্র্যটি ফুটে ওঠে। অন্তরা ও আভোগের একত্র পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি বর্ষার দ্বৈতরূপ --- - নবযৌবনা বর্ষার জলসিক্ত ভৈরব হর্ষময় রূপ , তারপর তার অগ্নিময় উদাসী রূপ।

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা :

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৪৫৪ - ৪৫৫
২) তদেব,পৃ ৪৭০
৩) তদেব,পৃ ৪৩৭- ৪৩৮
৪) তদেব,পৃ ৪৫৮
৫) তদেব, পৃ ৪৪৬
৬) তদেব, পৃ ৪৭৭
৭) তদেব, পৃ ৪৫৮
৮) তদেব, পৃ ৪৭২
৯) তদেব, পৃ ৫৪৩-৫৪৪

১০) সংখ্যাসহ প্রকৃতি পর্যায়ের এই গানগুলি হল : এসো শ্যামল সুন্দর (২৬), ওই আসে ওই অতি (২৭), শাঙন গগনে (২৮), আমার দিন ফুরালো(৩৬), বাদল মেঘের মাদল বাজে(৩৭), গহন রাতে বাদল ধারা (৪৭), আজি ওই আকাশ পরে (৫০), এই শ্রাবণের বুকের ভিতর (৬০),এই সকাল বেলার বাদল আঁধারে (৬১), বাদল বাউল (৭২), একি গভীর বাণী (৭৩), বৃষ্টিশেষের হাওয়া (৭৪),ধরণীর গগনের (৮৪),ওই কি এলে আকাশপারে (৯০), চিত্ত আমার হারাল (১০০), হৃদয়ে মন্দ্রিল (১০৩), আঁধার অম্বরে (১১২),ওগো সাঁওতালি ছেলে (১২৫),এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও (১২৮),স্বপ্নে আমার মনে হল (১৩১)।

১১) সংখ্যাসহ প্রকৃতি পর্যায়ের এই গানগুলি হল : এসো শ্যামল সুন্দর (২৬),ওই আসে ওই অতি (২৭),ঝরঝর বরিষে(২৮),গহন ঘন(২৯),হেরিয়া শ্যামল ঘন(৩০),শাঙন গগনে (৩১),আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল (৩৩),আজি বারি ঝরে (৩৪),কাঁপিছে দেহলতা (৩৫),আমার দিনফুরালো(৩৬),বাদল-মেঘে মাদল বাজে (৩৭),আকাশতলে দলে দলে (৪০),কদম্বেরই কানন ঘেরি (৪১),আষাঢ় কোথা হতে আজ (৪২),ছায়া ঘনাইছে (৪৩),শ্রাবণবরিষণ পার হয়ে (৪৫),যেতে দাও (৪৮),ভেবেছিলেম আসবে ফিরে (৪৯),আজ শ্রাবণের আমন্ত্রনে (৫৬),বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা (৫৮),এ শ্রাবণের বুকের ভিতর (৬০),মেঘের কোলে কোলে (৬১),আজি বর্ষারাতের শেষে (৬৯),শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার (৭০),ভোর হল (৭৫),বৃষ্টিশেষের হাওয়ায় (৭৬),ঝরো ঝরো ঝরো (৭৮),এসো নীপবনে (৭৯),কোথা যে উধাও হল (৮০),আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে (৮১),পুব হাওয়াতে(৮২),অশ্রুভরা বেদনা(৮৩), বন্ধু রহো রহো(৮৫), নমো নমো নমো (৮৮), ওই কি এলে (৯০), গগনে গগনে (৯১), শ্রাবণ তুমি(৯২), চলে ছলোছলো(৯৬), আবার এসেছে আষাঢ়(৯৮), চিত্ত আমার হারালো(১০০), আবার শ্রাবণ হয়ে (১০১),হৃদয়ে মন্দ্রিল (১০৩),আমি তখন ছিলেম মগন(১০৫),আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই (১০৬), ভোর থেকে আজ বাদল (১০৭),নীল নব ঘনে (১০৮),থামাও (১০৯),আজি পল্লিবালিকা(১১০),হৃদয় আমার(১১৩),আজ বরষার রূপ(১১৪),মম মন-উপবনে (১১৭),কিছু বলব বলে (১২১),মন মোর

মেঘের সঙ্গী(১২২),মোর ভাবনারে (১২৩),আমার প্রিয়ার ছায়া (১২৪),আজি তোমায় আবার (১২৫),এসো গো (১২৮),আজি ঝরো ঝরো (১২৯),শ্রাবণের গগনের গায় (১৩০),স্বপ্নে আমার মনে হল (১৩১),এসেছিলে তবু আস নাই (১৩৩),আমার যে দিন (১৩৬),পাগলা হাওয়ার (১৩৭)।

১২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ ৪৪৫- ৪৪৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩

দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বিশ্বাস, অপূর্ব : ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র-কবিমানস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬

রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১

রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৮০

সরকার, পবিত্র : রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃজনভিত্তি ,গানের ঝরনাতলায়, কলকাতা,প্রতিভাস , ২০১৩

সর্বাধিকারী, কেতকী : রবির আলোয় ঋতুদের শোভাযাত্রা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৪

সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮২